মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে আওয়াজ উঠেছে

SEZ হটাও!

৩০ অক্টোবর ২০০৬ মহারাষ্ট্রের ‘SEZ হটাও সঙ্ঘর্ষ সমিতি’ এবং ‘সর্বহারা জন আন্দোলন’-এর কর্মী শ্রীমতী উল্কা মহাজনের সঙ্গে আমরা আলাপ করি কলকাতার [illegible] ভবনে। তিনি খেতমজুরদের একটি নাটকের দলের সঙ্গে কলকাতার কার্জন পার্কে ‘জনসংস্কৃতি’ আয়োজিত নাট্যোৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। এছাড়া সিঙ্গুরে ২৭ অক্টোবর জনশুনানিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। হিন্দিতে দেওয়া তাঁর এই সাক্ষাৎকারটির অনুবাদ করেন শমীক সরকার।

উ.ম. আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ ছিলেন, আলাদা আলাদা মতের মানুষ, যাঁদের উপদেশ আমরা মেনে চলতাম, যেমন পার্টিতে চিন্তাশীল মানুষ থাকেন, ওঁরা আমাদের বারবার বলার চেষ্টা করেছিলেন, একটি মতবাদের চশমা পড়ে তোমরা দুনিয়াকে দেখো না। ওখান থেকেই আমাদের শুরু। প্রথম থেকেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমরা নতুন করে পরিস্থিতিটাকে বুঝব, রাস্তা খুঁজব।

একথা বলা জরুরি, রাজনৈতিকভাবে আমরা সবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সিপিএম, সিপিআইয়ের কথা শোনার চেষ্টা করেছিলাম। ছাত্রাবস্থায়, সিপিআইএমএল-এর সঙ্গেও একটা যোগাযোগ হয়েছিল। সোশালিস্টদের তো মহারাষ্ট্রে বেশ ভালো প্রভাব ছিল, একটা বড়ো ঐতিহ্যও ছিল। এদের মধ্যে সিপিআইকে কিছুটা মানিয়ে চলার মতো মনে হয়েছিল, ওরা কিছুটা অন্যের কথা শুনতে চায়। রাজনৈতিক, আদর্শগত এবং বিশ্লেষণে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে অন্যের কথা তো শুনতে হবে। সোশালিস্টরা অবশ্য খুবই অন্যের কথা শোনে, মানিয়ে চলে, অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করে, খুবই খোলামনের উদার। সিপিএম তো প্রথমে নিজের দলে টানার চেষ্টা করবে, ওদের মাপে খাপ না খেলে তুমি বাতিল। একভাবে বললে, ওদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অথবা সংলাপের কোন জায়গা নেই। এটা আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সিপিএমের ক্ষেত্রে দেখেছি। ওদের আদর্শগত অবস্থানটাই এমন, একদম মানিয়ে চলার ব্যাপার নেই। ওদের বানানো কোন খাপে তোমাকে বসিয়ে দেওয়া হবে, ব্যস, সেখানেই তুমি বসে থাকো। তবু আমি বলব, কোনও বিশেষ মতবাদের সঙ্গে আমরা যুক্ত নই।

মন্থন খবরের কাগজে রায়গড়ের পেন তালুকের গান্ধীবাদী এক নেতার কথা এসেছিল ...

উ.ম. জনার্দন মাহ্তড়ে? তিনি তো আমাদের সাথী। তিনি গ্রামের একজন কৃষক। স্থানীয় মানুষ যেমন অনেকদিন থেকে গান্ধীকে মেনে আসছেন, সেরকমই একজন। তবে গান্ধীবাদীদের হামেশা যেরকম দেখতে পাই, তাঁর অনুসারীরাই তাঁকে খতম করে দিয়েছে। ওদের কাছে কর্মসূচী বা নতুন করে দেখবার পদ্ধতি তো কিছুই বেঁচে নেই।

মন্থন সে তো মার্ক্সবাদীদের সম্পর্কেও বলতে শুনি, মার্ক্সবাদকে তারাই খতম করেছে।

উ.ম. একদম। সেই কারণে শুরু থেকেই আমাদের প্রবীণেরা বলেছিলেন, কোনও ‘বাদ’-এ যেও না। কী বলছে ওরা শোনো। নিজের রাস্তা দেখো। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান এরকম।

আমার বাবা বিচার-বিবেচনার দিক থেকে নিজে মার্ক্সবাদী ছিলেন। সরকারি কর্মচারী, কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত বই আসত, তার মধ্যে অনেক মার্ক্সীয় বইও ছিল। তার একটা প্রভাব আমার মধ্যে আছে। কিন্তু তিনি মার্ক্সকে মানতেন আর গান্ধীকেও মানতেন। বাবাসাহেব আম্বেদকরকেও মানতেন।

মন্থন আপনার পড়াশুনা কবে শেষ হয়েছে?

উ.ম. ১৯৮৯-এ পড়া শেষ হল।। ১৯৯০ সাল থেকে আমাদের সংগঠনের কাজ শুরু হয়। তো এই তিনজনের প্রভাবই আমাদের মধ্যে রয়েছে। আর মহারাষ্ট্রে তো মহাত্মা ফুলেরও একটা ঐতিহ্য রয়েছে। আমি এটা মানি, মহাত্মা ফুলের ভাবনা-চিন্তা বা কাজকর্ম এমন বিস্তৃত না যে তাকে ফুলেবাদ বলা যায়। কিন্তু তিনি ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, সমাজকেও বোঝার চেষ্টা করেছেন। আর ওই সময়ের যে সব কাজের কথা এখন জানতে পারা যাচ্ছে, তা তো তারিফযোগ্য। এই নিয়ে হল আমাদের রাজনৈতিক পরিচয়।

মন্থন আপনি তো বিভিন্ন মতবাদ বা দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বললেন। কিন্তু এর যে প্রয়োগের দিক, সেখানে আপনাদের অবস্থাটা কী?

উ.ম. এখনও তো বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে কারোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অবস্থা কার্যক্ষেত্রে নেই। অ্যালায়েন্স একটা পদ্ধতি। মহারাষ্ট্রে অনেক অ্যালায়েন্স আছে। যেমন ‘খাদ্যের অধিকার’ নিয়ে অ্যালায়েন্সে সিপিআই, সিপিএম, বহু ট্রেড ইউনিয়ন, অসংগঠিত শ্রমিক, সবাই তো রয়েছে। আজকের দিনে মনে হচ্ছে যে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

মন্থন আপনার মূল কাজের জায়গা কি নাটক?

উ.ম. না। মূল কাজের জায়গা আমার ক্ষেতমজুর আর আদিবাসীদের ইউনিয়ন। রায়গড়ে। মুম্বাইয়ের কাছাকাছি হওয়ার কারণে সেখানে জমি আর ভূসম্পত্তির ওপর আক্রমণ হয়ে চলেছে। জমি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মন্থন মুম্বাই শহর থেকে রায়গড় কত দূর?

উ.ম. মুম্বাই শেষ হলেই রায়গড় জেলা। এই যে SEZ-এর কথা উঠছে, যাকে ‘তৃতীয় মুম্বাই’ বলা হচ্ছে, তার অর্ধেক রায়গড়ের মধ্যে পড়ছে। এখানটাকে এক সময় কেমিকাল জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। এখানে অনেক কেমিকাল কারখানা আছে। মুম্বাইয়ের মিড্‌ল ক্লাস ট্যাক্স বেনিফিটের জন্য এখানে অনেক কৃষি ফার্ম হাউস করে রেখেছে। হোটেল আছে। মুম্বাই থেকে এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত আগ্রাসন হতে পারে তার সবই এখানে আছে। একটা তো জমি নিয়ে নেওয়া। তাই জমির অধিকারের লড়াই আমাদের একটা বড়ো লড়াই।

মন্থন কবে থেকে এই লড়াই শুরু হল?

উ.ম. ১৯৯০ থেকে। তবে একদম প্রথমে লড়াইটা ছিল জঙ্গলের অধিকারের লড়াই। জঙ্গলের জমিতে যে ক্বাথকরী সমাজ, তারা একেবারে ভূমিহীন, ৯৫ শতাংশই। এর মানে এই নয় যে তাদের জমি নেই। তাদের জমির অধিকার নেই। তাই ‘অন রেকর্ড’ তারা ভূমিহীন। ক্বাথকরীর ‘ক্বাথ’[১] মানে হল ‘ক্বাথা’, যা পানের সঙ্গে খায়। সেগুলো বানানোই ছিল এদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। কিন্তু এই পেশা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জঙ্গল যেভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ক্বাথকরীদের পটুতা নষ্ট হয়েছে, গোটা শিল্পটাকেই ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এসব দু’পুরুষ আগের কথা, প্রায় ষাট-সত্তর

---

১ পানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত গাছবিশেষের কষায় ক্বাথ, প্রচলিত নাম খয়ের।

বছর। এখনকার প্রজন্মের কেউ ক্বাথা বানায় না, বানাতে জানে না।

এরপর ওদের যে পেশা এল, তা হল জঙ্গলে কয়লা বানানো। নব্বইয়ে আমরা যখন সংগঠন গড়তে শুরু করি, তখন এটাও তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কয়লার বিষয় নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে আলাদা আলাদাভাবে। কোঙ্কনের অন্য যেসব জেলায় কয়লা বানানো হত, সেখানে কৃষকদের আন্দোলনে জঙ্গল বিলুপ্ত হওয়া নিয়ে বিক্ষোভ ছিল। পরিবেশের বিষয় ছিল। কয়লার ভাঁটিতে যে আদিবাসীরা কাজ করত, তাদের ওপর খুবই খারাপ ধরনের শোষণ চলত। তখন রায়গড়ে দু'একটা যে সংগঠন ছিল, তাদের ইস্যু ছিল আদিবাসী মজদুরদের ওপর শোষণ। এই দুই বিষয় নিয়ে আন্দোলনের প্রভাবে ওই অঞ্চলে কয়লার ভাঁটি বন্ধ হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রের বাকি জায়গায় তা হল না। ১৯৮৯-৯০তে আমি যখন ওখানে ঘুরছিলাম, তখন ওদের সামনে প্রশ্ন ছিল, কী কাজ তারা করবে এবার?

আপনি কি একাই ছিলেন?

প্রথম কয়েকমাস তো একলাই। তারপর আমার এক বান্ধবী এল আমার সঙ্গে কাজ করতে। তারও এটা ভালো লাগত। তারপর দু'বছর আমরা দুই বন্ধু মিলেই এটা করতাম। সেই দু'বছর আমরা দেখেছি, খুবই হতাশজনক অবস্থা, কয়লার কাজটা চলে গেছে, ক্বাথকরী সমাজের মানুষেরা আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় আখের খেতে কাজ করতে যেত। কিন্তু সেসব জায়গার আবহাওয়া, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিল না। তো এক-দু'বছর পর তারা আখের খেতে মজদুরির কাজ একদমই ছেড়ে দিল। ধানের খেতে কাজ করতে গেল। কিন্তু তাতে ছ'মাস কাজ পেত তারা, যেহেতু ওখানকার সব জমি একফসলি। বাকি ছ'মাস তারা এদিক-ওদিক চলে যেত কাজের জন্য। ছ'মাস ওখানে থেকে বাকি সময় পুরো সমাজটা বাইরে চলে যেত।

কতদূর যেত?

কর্নাটক অবধি। দু'বছর এমনই চলল। তারপর তারা ইটভাটায় কাজ করতে লাগল। আমাদের কাজের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল ইটভাটার শ্রমিকদের মধ্যে কাজ। ওখানকার কাজের পরিবেশ, শ্রমিকদের অধিকার ...

ইটভাটা তো নদীর ধারে হয়? ওখানে কি কোন নদী আছে?

বড়ো তেমন কিছু নয়, তবে ছোটো ছোটো নদী বা জলধারা আছে। এরা বাইরে চলে যেত মানে জেলার মধ্যে, জেলার বাইরেও সেই কর্নাটক অবধি। শুরুতে আমাদের সংগঠনের পরিচিতি ছিল আদিবাসী সংগঠন হিসেবে।

এটা রায়গড়ের কোন তালুক বা তহশিলে?

শুরুতে আমাদের কাজ ছিল মারগাঁও তহশিলে। প্রথম পাঁচ-ছ'বছর আমি ওখানেই থাকতাম। এখনও আমাদের কাজের কেন্দ্র মারগাঁও। ওখান থেকেই কাজ এগোতে থাকল। আর এক ধরনের চাষ ছিল ওখানে — দরি-জমির — যেটাকে জুম চাষ বলে, আজ এক জায়গায় করব তো কাল অন্য জায়গায়। জঙ্গলের জমি, যেটা ব্রিটিশ আমলে দেওয়া হয়েছিল চাষের জন্য। দরি মানে হল পাহাড়ের ওপর যে ঢাল থাকে তাকে চাষের জমি বানিয়ে চাষ করা হয়। ওতে চাষের যা পদ্ধতি তাতে লাগাতার চাষ হয় না। একবছর রাগি হয়, পরের বছর বড়ি নামক একটা ফসল, তৃতীয় বছরে তিল চাষ করা হয়। তারপর দু'তিন বছর ফাঁকা থাকে জমি। এটাকে বলে ঘুরে ঘুরে চাষ। ব্রিটিশদের মনে হয়েছিল, আদিবাসীদের জন্য জঙ্গলের ক্ষতি হবে। তাই তারা ক্বাথকরী সমাজের চষার জন্য জঙ্গলের ধারে ওরকম কিছু জমি দেয়। তখন থেকে ক্বাথকরী সমাজ ওভাবেই চাষ করে চলেছে। ধান ওখানে হয় না। স্বাধীনতার পরে জমির অধিকারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীরা আন্দোলন করে। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে মহারাষ্ট্রে জমির বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের একটি সিদ্ধান্ত হয় যে ক্বাথকরী সমাজের জমির অধিকার নথিভুক্ত হবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত রূপায়িতই হয়নি। কারণ ক্বাথকরী সমাজের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না। কোন সংগঠন ছিল না, প্রতিনিধি ছিল না। আর এইভাবে বাইরে কাজ করতে চলে যাওয়ার ফলে তাদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ই ছিল না। কারণ ভোট সাধারণত বর্ষার সময় হয় না। তাই যখন নির্বাচন হয়, তখন ওরা কেউ ভোট দেওয়ার জন্য এখানে থাকে না। অন্য অন্য জায়গায় চলে যায় কাজের খোঁজে। তাই ১৯৭১-এর সিদ্ধান্তের কোনও প্রয়োগ হল না। ১৯৮০-তে জমি সুরক্ষা আইন হল। তারপর তো সমস্ত জমি হস্তান্তর থেমে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন জমি হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯৯০-এ আমরা যখন কাজ শুরু করলাম, তখন জমির অধিকারের বিষয়টা সন্ধান করতে গিয়ে এটা বুঝতে পারলাম। পুরনো মানুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বললেন, ওইসব জমি সংক্রান্ত একটা বই ছিল, যাতে কোন বছরে কী কী ফসল হয়েছে, কত লোক কাজ করেছে রেকর্ড করা হত। আর ওই জমি ওঁরা পেয়েছিলেন যৌথভাবে। এটা এখনকার বিশেষত্ব। অন্যসব জায়গায় তো জমিতে পাট্টা বা লিজ দেওয়া হয় পরিবার হিসেবে। এখানেও লিজ দেওয়া হয়েছিল এক একটা ছোটো গ্রামের কৌমসমাজ হিসেবে। যখন ব্রিটিশরা দিয়েছিল, সেটা উনবিংশ শতাব্দীর কথা। আমরা প্রথমে এই খোঁজাখুঁজির কাজটাই শুরু করেছিলাম।

ওখানে দেখলাম দরি-জমির অধিকারের একটা লড়াই ছিল যেটা আজও জারি রয়েছে। লিজে দেওয়া জমিগুলোকে নথিভুক্ত করানোর আন্দোলন। প্রথমের দিকে আমি ওদের বাজারে যেতাম। সেখানে কাগজ বিলি করে বলতাম, দরি-জমির অধিকারের বিষয়ে আজ একটা মিটিং হবে। সামনের হাটবারে অমুক গাছতলায় বা অমুক মন্দিরে আপনারা আসুন। এই একটা দাবিতেই সংগঠন তৈরি হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে বলতে লাগল, আমাদেরও দরি-জমির দাবি আছে। দাবিটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই থেকে শুরু, তারপর

গণশক্তি ২৪শে নভেম্বর, ২০০৬ শুক্রবার

এস ই জেড নিয়ে মহারাষ্ট্রে বিক্ষোভ কৃষকদের

আই এন এন : নয়াদিল্লি, ২৩শে নভেম্বর— সারা ভারত কৃষকসভার ডাকে দিল্লির যন্তর-মন্তরের সামনে গত ২১শে নভেম্বর, মঙ্গলবার এক ধরনার আয়োজন করা হয়। মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকরা প্রস্তাবিত মহামুম্বাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এস ই জেড) বিরুদ্ধে এই ধরনায় শামিল হন। এঁদের আশঙ্কা, পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে উৎপাদিত প্রধান ৪৫টি জেলার ১১হাজার হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধরনার শুরুতেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

ধরনায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষকসভার সম্পাদক এবং সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য কে বরদারাজন। তিনি বলেন, যদিও এই কর্মসূচীর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত হবে না। তবু এই নীতি পাল্টাতে আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে।

তো জমির অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত বহু বিষয় আসতে লাগল। আরও পরে এই সংগঠন আর ক্বাথকরী সমাজের মধ্যে সীমিত থাকল না। জমির অধিকার যে যে কৌমের আলাদা আলাদা রয়েছে, তাদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে গেল। মজদুরির সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলোও যখন উঠতে থাকল, সংগঠন কেবল ক্বাথকরী সমাজের মধ্যে আটকে থাকল না। কিন্তু প্রথমদিকে ক্ষেতমজুরদের অধিকার নিয়ে যখন আমাদের লড়তে হয়েছিল, ওখানকার চাষীসমাজের সঙ্গেও আমাদের সংঘর্ষ হল। তাদের সবাই যে বড়ো চাষী ছিল, তা নয়। বড়ো চাষীদের সঙ্গে তো সংঘর্ষ হলই, জমিদারদের সঙ্গেও হল। কিন্তু পাঁচ একর বা আট একর জমি যাদের আছে, এমন মাঝারী বা ছোটো চাষীদের সঙ্গেও আমাদের লড়তে হয়েছে। চাষী সত্তার জায়গা থেকে তারা নিজেদের বড়ো জমিদারদের সঙ্গে একাত্ম ভাবত। তাই শুরুতে আমাদের একটা ইমেজ তৈরি হয় যে আমরা চাষীদের বিরোধী সংগঠন। মজদুরদের পক্ষে, আদিবাসীদের পক্ষে, কিন্তু রায়গড়ের চাষীসমাজ আগ্রি আর কুর্মীদের বিরুদ্ধে।

মন্থন এরা তো পরম্পরাগতভাবে চাষী?

উ.ম. হ্যাঁ। কিন্তু আগ্রিরা কিছুকাল আগেও ক্ষেতমজুর ছিল। আপনি যদি বাবাসাহেব আম্বেদকরের রায়গড়ের ভূমি সংস্কার আন্দোলন বিষয়ে পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তখন ওরা ছিল প্রজা। এখন আদিবাসী সমাজের যে অবস্থা, তখন আগ্রি সমাজের একই অবস্থা ছিল। তারপর ভূমি সংস্কারের ফলে ওরা ওখানে বসতি গড়ল, চাষী হয়ে গেল, চাকরিজীবী হল। ওরা মধ্যবিত্ত হয়ে গেল। তো আমরা তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লাম। রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদের চাষী বিরোধী সংগঠন বলে প্রচার করে দেওয়া হল। এই জেলায় আদিবাসী আছে ১২ শতাংশ, ২ শতাংশ দলিত। আমরা হয়ে পড়লাম ১৪ শতাংশ লোকের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। আমরা মেনে নিলাম যে এতে যদি এই কৌমের কোন উপকার হয়, তবে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে পিটুনির খুব চল ছিল। ক্বাথকরী সমাজের কারও যদি কোনও ভুল হয়ে যেত কাজ করার সময়, তাহলে তাদের বেধড়ক মারা হত। কয়লার ভাটিতে যখন কাজ হত, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হত খনির ভিতর। ইটভাটাতেও মারধোর চলত।

১৯৮৯ সালে নিপীড়ন বিরোধী আইন এল। শুরুর দিকে সেটা বেশ কাজে লাগল আমাদের। আমরা ঠিক করলাম, মার আমরা একদম সইব না। এটা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসতে লাগল। তারা বলতে থাকল, কোন ধরনের মার আমরা সইব না।

মন্থন এই সংগঠনের নাম কী?

উ.ম. 'সর্বহারা জন আন্দোলন'।

মন্থন তাহলে এটা কৌম সংগঠন নয়, শ্রেণী সংগঠন।

উ.ম. হ্যাঁ, শ্রেণী সংগঠন। এটাই আমরা প্রথম থেকে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ আমাদের ওপর আরোপ লাগানো হচ্ছিল যে আমরা আদিবাসীদের সংগঠন, মজদুরদের সংগঠন, ক্বাথকরীদের সংগঠন। আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে এটা কেবল আদিবাসীদের সংগঠন নয়, সব ধরনের গরিব ও মজদুরদের সংগঠন, ছোটো চাষীদের সংগঠন। আজ তা বাস্তবায়িত হচ্ছে, বাকি সমাজ ও কৌমগুলি শামিল হচ্ছে। প্রথম দশ বছর আমাদের সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। ওখানকার জমিদারদের বিরুদ্ধে মজদুরদের লড়াই চলেছে। এখনকার যে পরিস্থিতি, সেখানে লড়াই করা আরও মুশকিল। কারণ শুরুর দিকের লড়াইয়ে আমরা বুঝেছিলাম, আমা[illegible] ওখানেই লড়তে হবে, লড়াইটা স্থানীয়। ওখানেই চাষীদের বি[illegible] লড়াই, রেশনের জন্য লড়াই, তাতে বড়ো জোর স্থানীয় [illegible] বা জেলান্তর অবধি যেতে হত। ওখানেই কোন না কোন সমা[illegible] বেরিয়ে যেত। এখনকার যে কোন বিষয়, তার সমাধান আর ও[illegible] থাকছে না। তা খুবই কেন্দ্রীভুত হয়ে উঠছে, এত দূর পর্যন্ত [illegible] যাচ্ছে যেখানে আমজনতার পৌঁছানোর উপায় নেই। দরির সম[illegible] হোক, রেশনের সমস্যা হোক, আপনাকে কেন্দ্রীয় সরকার অ[illegible] যেতে হবে। কারণ সেখানেই সিদ্ধান্ত হবে দারিদ্র সীমার কোটা ক[illegible] সেখানেই সিদ্ধান্ত হবে গরিবি সীমার কত কার্ড বিলি হবে, অন্ত্যো[illegible] যোজনার কত কার্ড বিলি হবে। রেশনের লড়াই থেকে শুরু ক[illegible] বড়ো যে কোন বিষয়ের লড়াই পর্যন্ত স্থানীয় লড়াই বলে আর [illegible] থাকছে না। এখন পরিস্থিতিই এমন যে আপনাকে ওদের উঠো[illegible] গিয়েই লড়তে হবে। ওরা চায় আপনি ওদের শর্তেই লড়ুন। [illegible] বুঝতে পারলাম যে, আমরা একলা বাঁচতে পারব না। অবশ্য [illegible] থেকেই আমাদের তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার মধ্যে এটা ছিল। হাত মেলা[illegible] হবে, কিন্তু কার কার সঙ্গে হাত মেলাব? আমরা খুঁজতে শুরু করলা[illegible] মহারাষ্ট্রে রায়গড় জেলায় গণসংগঠনের একটা ঐতিহ্য আছে। 'শো[illegible] জন আন্দোলন' নামে এক গণআন্দোলনের মোর্চা রায়গ[illegible] আদিবাসীদের মধ্যে ছিল।

মন্থন এটা কবেকার?

উ.ম. 'শোষিত জন আন্দোলন' আমাদের সংগঠন গড়ে ওঠার আ[illegible] থেকেই ছিল।

মন্থন কবে নাগাদ তৈরি হয়েছিল?

উ.ম. ১৯৭৮ সালের পরে। ১৯৭৯ থেকে প্রক্রিয়া কিছুটা শুরু হয়েছি[illegible] সত্তরের দশকে যখন জমির অধিকার স্থির হল, তখন অনেক সং[illegible] ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। জমির অধিকারের লড়াই তখন অনে[illegible] মাটি পায়। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও বেড়ে যায়। তখন [illegible] ধরনের উপলব্ধি আসতে শুরু করল যে আমরা একলা বাঁচতে পা[illegible] না। মোর্চা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া তখনই শুরু হল। আদিবাসী অঞ্চ[illegible] গণসংগঠনগুলো মিলে এই 'শোষিত জন আন্দোলন' মোর্চা বানা[illegible] এটাই ছিল ওই অঞ্চলের প্রথম মোর্চা। মোর্চা গড়ার দ্বিতীয় [illegible] শুরু হয়েছিল গ্লোবালাইজেশন বিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে দি[illegible] আমাদের পাশের জেলায় এনরন বিরোধী লড়াই শুরু হল। [illegible] রাজনৈতিক দল এবং বামপন্থীরা তখন এল। রায়গড়ে তথাক[illegible] এক বামপন্থী শক্তি, খেতকরী কামগর পার্টি বা পিজেন্ট ওয়া[illegible] পার্টি (PWP)-র যথেষ্ট প্রভাব আছে। রায়গড়ে বরাবরই PWP-[illegible] প্রভাব ছিল। ওই দলের নারায়ণ নাগো পাটিল বাবাসা[illegible] আম্বেদকরের সঙ্গে মিলে জমির অধিকার এবং ভূমি সংস্কারের ল[illegible] লড়েছিলেন। কিন্তু ওদের বাম চরিত্র এখন আর একদম নেই। [illegible] ওদের বামপন্থী বলে মানতে রাজি নই। যে নথিপত্র দলিল [illegible] মেনে চলে, তাতে এখনও ওরা বামপন্থী, তা মার্ক্সবাদ অনুস[illegible] করেই রচিত। প্রয়োগে ওরা মোটেই বামপন্থী নয়। মারাঠিতে ও[illegible] বলা হয় খেতকরী কামগর পক্ষ, সংক্ষেপে খেকাপ। আমরা [illegible] বলি খেত কন্ট্রাক্টর পার্টি, ওরা আর খেতকরী কামগরদের নয়, [illegible] এখন কন্ট্রাক্টরদের নিয়েই গঠিত। আগে ওদের যেসব এমএলএ [illegible] লোকে তাদের ভাই বলে ডাকত। যেমন কমরেড বলে ডাকা [illegible] তেমনই ভাই বলা হয়। মোহন ভাই পাটিল, যতীন ভাই পাটিল

এখন সবাইকে শেঠ বলে ডাকা হয়। মোহন শেঠ পাটিল, রাণা শেঠ পাটিল ...। ওরা নিজেদেরও শেঠ বলে, লোকেও সেই নামে ডাকে। আজকের পরিস্থিতিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল SEZ নিয়ে খেকাপ-র সঙ্গে সিপিএমের মোর্চা আছে। এক মজাদার অবস্থা চলছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে SEZ নিয়ে যে মোর্চা রয়েছে, তাতে সিপিএম আছে, সিপিআই আছে, সমাজবাদী জন পরিষদ আছে, বিভিন্ন গণসংগঠন আছে। রায়গড়ে যে মোর্চা, তাতে সিপিএম আর খেকাপ আছে। আসন্ন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য খেকাপ আর শিবসেনার মোর্চা।

মন্থন SEZ বিরোধী লড়াইয়ে তো শিবসেনাও আছে?

উ.ম. শিবসেনাও একটা অবস্থান নিয়েছে, কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, এখন চাষীদের সঙ্গে তারা আছে, এটা তাদের দেখাতেই হবে। কিন্তু ওরা তো এনডিএ-র শরিক। ২০০০ সালে SEZ-এর নীতি যখন নির্ধারিত হল, তখন এনডিএ-ই তো ছিল ক্ষমতায়। বেশ জটিল পরিস্থিতি। তো আমরা পড়লাম মুশকিলে, কার সঙ্গে আমরা হাত মেলাব? সিপিএম খেকাপ-র সঙ্গে গেছে। আবার খেকাপ শিবসেনার সঙ্গে গেছে। এই ধরনের আঁতাত তো খুবই সুবিধাবাদী ধরনের। কার সঙ্গে আমরা চলব? আর এখন যা পরিস্থিতি, তার ওপর SEZ-এর মতো একটা বিষয়, কোনও একটা দল বা একটা সংগঠন একা একা লড়া যাবে না।

মন্থন আপনি আগে বলেছিলেন, পঁয়ত্রিশ হাজার একর জমি নেওয়া হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল SEZ-এর জন্য।

উ.ম. হ্যাঁ, কিন্তু তা রায়গড়ের একটা এলাকায়। এছাড়া আরও সাতটা এলাকা চিহ্নিত হয়েছে রায়গড়েই। তাতে সাতটা তহশিল পড়ছে। শুরুতে কিছুটা হৈচৈ হয়েছিল এটা নিয়ে। কিন্তু তারপর সরকার চুপিসাড়ে আরও সাতটা এলাকার অনুমোদন দিয়ে দেয়।

মন্থন এই পঁয়ত্রিশ হাজার একরের মধ্যে কতগুলো তহশিল পড়ছে?

উ.ম. তিনটে। পনভিল, পেন আর পূরণ।

মন্থন আপনি তো এই এলাকার আন্দোলনে আছেন?

উ.ম. হ্যাঁ। কিন্তু এখানে তিনটে আলাদা মোর্চা তৈরি হয়ে গেছে SEZ-এর ইস্যুতে। একটা তো সিপিএম ও খেকাপ-র। এই খেকাপ-র ওপর লোকজনের ভরসা নেই। কারণ রিলায়েন্সের পরে এই SEZ হলে ওরাই সবথেকে বেশি উপকৃত হবে। কারণ ওরা সবাই কন্ট্রাক্টরের কাজগুলো পাবে। ওদের সব এমএলএ, সব জেলা পরিষদ সদস্য, প্রেসিডেন্ট, সবাই কন্ট্রাক্টর। সিপিএমের ওপর তাও কিছুটা ভরসা আছে লোকের। কিন্তু খেকাপ-র ওপর কারও ভরসা নেই। সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এখানে এসেছিলেন, মিছিল করেছেন। এখন একটা ডুবে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। মানুষ যাকে পারছে আঁকড়ে ধরছে। তাই এই আঁতাতের সঙ্গে কিছু লোক আছে। দ্বিতীয় মোর্চা হল দত্তা পাটিলের লোকেদের। দত্তা পাটিল মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী নেতা। খেকাপ-রই পুরনো দিনের লোক তিনি। কিন্তু খেকাপ থেকে ওঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোন পার্টিতে নেই। ব্যক্তি হিসেবেই তিনি গত সংসদ নির্বাচনে খেকাপ-র বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। অনেকটাই কংগ্রেসের দিকে, তবে কোন পার্টিতে যেতে রাজি হননি। এই দ্বিতীয় মোর্চা ওঁর নেতৃত্বে, সেখানে কোন পার্টি নেই। তৃতীয় একটা মোর্চা আছে, যেখানে ছোটো ছোটো গ্রামের সংগঠন আছে, দশ গ্রামের সংগঠন, পাঁচ গ্রামের সংগঠন। সবচেয়ে বেশি এধরনের সংগঠন হয়েছে পেন-এ। ওখানে পঁচিশটা গ্রামের সংগঠন তৈরি হয়েছে, যাদের বাকি দুটি মোর্চার ওপর কোনও ভরসা নেই। আমরা এদের সঙ্গে আছি।

মন্থন এই মোর্চার নাম কী?

উ.ম. এর নাম 'SEZ হটাও সঙ্ঘর্ষ সমিতি'। এই 'SEZ হটাও' অবস্থান কেবল এই মোর্চারই আছে। বাকি আর দুটি মোর্চার কারোরই 'SEZ হটাও' ধরনের অবস্থান নেই।

মন্থন বাকিদের লাইন কী? সমঝোতার?

উ.ম. হ্যাঁ, সমঝোতার। সিপিএমের তো পরিষ্কার লাইন, SEZ আইনের কিছু পরিবর্তন করো। SEZ রদ করো, এমন কিছু তারা বলছে না। দত্তা পাটিলের মোর্চা তো কিছু বুঝতেই পারেনি, যতক্ষণ না আমরা SEZ আইনের বয়ানটি তাদের হাতে দিয়েছি। ওরা SEZ কী জিনিস জানতই না। ওদের অবস্থান হল স্থানীয় জমি বাঁচানো। SEZ হটানোর কোনও লাইন ওদেরও নেই। রায়গড়ের এই তিন তহশিলে আমাদের সংগঠনের খুব একটা কাজ নেই। আমাদের সংগঠন রায়গড়ের দক্ষিণে। কিন্তু এত বড়ো একটা সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে, আমরাও শামিল হয়ে পড়লাম এই লড়াইয়ে। বোঝাশোনার কাজ শুরু হল। এভাবেই সম্পর্ক তৈরি হল। তৃতীয় আঁতাত গড়ে উঠল। কিন্তু এই যে বড়ো মিছিল হল, সীতারাম ইয়েচুরি এসেছিলেন, তাতে তিনটে মোর্চার লোকই শামিল হয়েছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম আলাদা আলাদা চলব না, ভূমিকা আলাদা আলাদা থাকবে, কিন্তু একসঙ্গে চলার চেষ্টা করব। তিনটে মোর্চাই এই সমমনস্কতাতে পৌঁছেছিল।

মন্থন কোথায় হয়েছিল এই মিছিল?

উ.ম. কোঙ্কন ভবনে। এই তিন তালুকের কমিশনার নিউ মুম্বাইয়ে বসেন, ওখানেই অফিস। আজ ওখানে ল্যান্ড সার্ভের জন্য লোক যাচ্ছে। প্রথমে ওরা ঘোষণা করেছিল, ৬ তারিখ ল্যান্ড সার্ভে হবে। আমরা অ্যাকশন প্ল্যান বানাই, যে গ্রামে ওরা সার্ভে করতে যাবে, মোট পঁয়তাল্লিশটা গ্রামের লোকই এককাট্টা হয়ে সেখানে যাবে। কিন্তু ওরা আচমকা ঠিক করে আজ ৩০ তারিখই ল্যান্ড সার্ভে হবে একটা গ্রামে। দেখা যাক ওখানে কী হয়।

মন্থন জমি অধিগ্রহণের জন্য ওরা কি নোটিশ দিয়েছিল?

উ.ম. হ্যাঁ, ৪(১) ধারায় ওরা নোটিশ দিয়েছিল। তাতে লোকে অবজেকশনও দিয়েছিল। হাজার হাজার অবজেকশন জমা পড়েছিল। তার শুনানি চলছে। তিন-চার জায়গায় হয়েও গেছে। এই যে জমিটা ওরা নিতে চাইছে, এটা রায়গড়ের সবচেয়ে ভালো জমি।

মন্থন এই অবজেকশনে কী কী আপত্তি তোলা হয়েছিল?

উ.ম. প্রথমত ছিল, এখানকার জমি সবচেয়ে উর্বর। এটাকে ধানের গোলা বলে মনে করা হয়। এই কারণে জমি নেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, জমি নিয়ে নিলে শুধু জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দিলে হয় না, গোটা অঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব পড়ে। তৃতীয়ত, বিশেষ আর্থিক অঞ্চল হলে এই জমিটা উঁচু করা হবে, আর তাতে গোটা অঞ্চলটা ডুবে যাবে। কারণ অঞ্চলটা সমুদ্রতল থেকে ছ'ফুট নীচে। এখনও গ্রামগুলোকে বাঁচানোর জন্য বাঁধ দিতে হয়। দিনরাত সেগুলোতে নজর রাখতে হয়। যখন জোয়ার আসে, তখন এই বাঁধই গ্রামগুলোকে বাঁচায়। চতুর্থত, জীবিকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই যেহেতু চাষ ছাড়া কোন বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না, তাই জমি নেওয়া যাবে না। চাষীরা সরকারি কর্তাদের জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনারা আমাদের বলুন, এর ফলে কী ধরনের উন্নয়ন দেশের হবে? যদি আপনারা আমাদের বোঝাতে পারেন যে এতে

দেশের উন্নয়ন হবে, তবে আমরা পুরো জমি ছেড়ে দিতে তৈরি আছি।' কিন্তু সরকার কোন আলাপ-আলোচনায় যাচ্ছে না। এইসব অবজেকশনে আরও কিছু কথা আছে স্থানীয় ভিত্তিতে, অবজেকশনের ফরম্যাটে তার জন্য আমরা জায়গা ছেড়ে রেখেছিলাম। এরকম হাজার হাজার অবজেকশন জমা পড়েছে। ওগুলোর শুনানির নাটক করছে সরকার।

মন্থন এখানে আগ্রি আর কুর্মি সমাজের লোকেরা কি আছে?

উ.ম. এই এলাকাতে আটানব্বই শতাংশই আগ্রি সম্প্রদায়ের। এক-দুটো ছোটো গ্রামে কিছু আদিবাসী আছে। আদিবাসীরা, কাথকরীরা মূলত থাকে পাহাড়ে। রায়গড় দুটো এলাকাতে বিভক্ত। একটা হল দোঙর পাট্টা, মানে পাহাড়ী এলাকা। আর একটা হল খার পাট্টা, অর্থাৎ নোনাভূমি। এই এলাকাটা সমুদ্রের ধারের, এই সমভূমিতে আপনি আদিবাসীদের দেখা পাবেন না।

মন্থন আপনাদের সংগঠনের কাঠামোটা কেমন?

উ.ম. গ্রামের পঞ্চাশ শতাংশ লোক যদি সংগঠনের সদস্য হয়ে যায়, তাহলে গ্রাম কমিটি তৈরি হয়। সদস্য চাঁদা বছরে পঁচিশ টাকা। গ্রাম কমিটিগুলো যদি তালুক জুড়ে হয়ে যায়, তাহলে গ্রাম কমিটিগুলো নিয়ে জোনাল কমিটি তৈরি হয়। আর তারপর সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটি। এই হল কাঠামো। সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটিতে নির্বাচিত লোকেরা আসে। গতবার যখন নির্বাচন হয়েছিল, তখন ৫৩০টা গ্রাম কমিটি ছিল আমাদের।

মন্থন সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটিতে যারা নির্বাচিত হয়, তারা কি আদিবাসীদের বাইরে থেকে আসা?

উ.ম. না, না। আমি একাই বাইরে থেকে আসা। বাকি সবাই গ্রামগুলোর।

মন্থন নির্বাচনের পদ্ধতিটা কেমন?

উ.ম. একটা জেনারেল বডি মিটিং হয়। কিন্তু তার আগে আরও কিছু প্রক্রিয়া চলে। যেমন, প্রতিটা তালুকের জোনাল কমিটি মিটিং। এই মিটিংয়ে বসে সেন্ট্রাল একজিকিউটিভের তালিকা তৈরি হয়।

মন্থন এই সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কত বড়ো? প্রতিটা গ্রাম থেকেই কি সদস্য থাকে?

উ.ম. না, আমরা প্রতি বছর ঠিক করি, সেন্ট্রাল একজিকিউটিভের সংখ্যা বাড়ানো হবে না কমানো হবে। এখন ১৭ জনের সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটি আছে।

মন্থন আর জেনারেল বডি?

উ.ম. জেনারেল বডির তারিখ দেড়-দু'মাস আগে থেকে বলা হয়, সেখানকার মরসুমের কথা মাথায় রেখে। একটা বার্তা দেওয়া হয় গ্রামে গ্রামে।

মন্থন কোন ভাষায়?

উ.ম. কাথকরী সমাজের ভাষা কাথকরী। কিন্তু তারা মারাঠিও বোঝে। বার্তাটা মারাঠিতেই দেওয়া হয়।

মন্থন এখনকার SEZ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে কিছু বলুন।

উ.ম. এখনকার আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে, রিলায়েন্সের প্রচুর এজেন্ট আছে। অনেক আগে থেকে রিলায়েন্স কাজ শুরু করেছে ওখানে। প্রথম প্রথম বলা হচ্ছিল, একটা 'তৃতীয় মুম্বাই' প্রকল্প হবে ওখানে। তখনও SEZ-এর কথা কিছু বলা হয়নি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, কোন একটা বড়ো প্রকল্প হতে চলেছে। যতদিন না অধিগ্রহণের ঘোষণা হল, ততদিন কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু রিলায়েন্স আগে থেকেই জানত। ওরা আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ওরা গ্রামে গ্রামে সার্ভে করেছে। কোন লোকের কী আছে দেখেছে। তারপর ওদের এজেন্ট তৈরি করে নিয়েছে গ্রামে গ্রামে। শুরুতে ওরা চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কেনার চেষ্টা করেছিল। তাতে তারা পঁয়ত্রিশ হাজার একরের মধ্যে মাত্র তিরানব্বই একর জমি কিনতে পেরেছিল। বাকি জমি কেউ বিক্রি করতে চায়নি। তখন ওরা সরকারের কাছে গেছে। বাকি জমি চায়। সরকারকে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলে।

রিলায়েন্স গ্রামে গ্রামে এজেন্ট বানিয়েছে বেছে বেছে। অল্পবয়সী ছেলে, রোজগার নেই কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে; ভালো কথা বলতে পারে; মস্তিবাজ টাইপের — এদেরকেই বেছে বেছে এজেন্ট বানিয়েছে রিলায়েন্স। এদের মধ্যে এমন লোকও কিছু আছে ... আমরা একজনকে জানি, যার ওপর চুয়ান্নটা মার্ডারের কেস ঝুলছে। এভাবে কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের এজেন্ট বানানো হয়েছে। তাদের মোবাইল দেওয়া হয়েছে, মোটর সাইকেল দেওয়া হয়েছে। তারা খুব তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে। গ্রামের পুলিশ যারা, তাদেরও কিনে নিয়েছে রিলায়েন্স। সরকার ওদের মাসে ৮০০ টাকা দেয়, রিলায়েন্স দেয় ২০০০ টাকা। পুলিশ থেকে শুরু করে পুলিশ স্টেশন, রাজস্ব ব্যবস্থা — সব কিনে নিয়েছে রিলায়েন্স। আর মহারাষ্ট্রে মন্ত্রালয়ের দেড়শ'র বেশি আধিকারিক রিলায়েন্সে শামিল হয়েছে। মূলত এরা রাজস্ব ও পর্যটন দপ্তরের। রিলায়েন্সের সেট-আপ তৈরি হবে, তাই এরা সরকারি চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে রিলায়েন্সে যোগ দিয়েছে। কেউ দু'বছর, কেউ চার বছর, কেউ পাঁচ বছরের জন্য। কারণ এদের মানুষকে ম্যানেজ করার ক্ষমতা আছে। পুণের পুলিশ কমিশনার প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তাই নিয়ে অনেক কথা ওঠায় কেন্দ্রীয় সরকার তার ছুটি আটকে দিয়েছে। তার আগেই অনেকে যোগ দিয়েছে। এমনকি যে সমস্ত আধিকারিকের ইমেজ ভালো, এরকমও কিছু লোক রিলায়েন্সে চলে গেছে। এরাই রিলায়েন্সের পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করছে।

মন্থন রিলায়েন্সের দরকার তো দশ হাজার একর?

উ.ম. সিডকো-র তিন হাজার একর ছিল, সেটা আগেই রিলায়েন্স নিয়েছে। মানুষের এখন মত হল, জমি বেচব না। এমনকী কোন নেতা যদি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের এত লাখে হবে না, এত লাখ চাই, তাকেও মানুষ মঞ্চ থেকে নীচে নেমে যেতে বলে। মানুষ জমির দাম নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাইছে না। তারা জমি বিক্রি করতে চাইছে না। বড়ো অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে, যে গ্রামে সরকার সার্ভে করতে আসবে, সেখানে পঁয়তাল্লিশটা গ্রামের লোক একজোট হয়ে সরকারি আমলাদের সরিয়ে দেবে। সংবাদপত্রে সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, মানুষ মরে যাওয়ার জন্যও তৈরি কিন্তু জমি দেবে না। দেখা যাক কী হয়? এখন অনেক যেমন এতগুলো অ্যালায়েন্স হয়েছে। এবার আমাদের খুঁজতে হবে, রাস্তা কী?

মন্থন এই আন্দোলনে আপনাদের বর্তমান নাটকের ভূমিকা কী?

উ.ম. এই নাটক যখন আমরা বানিয়েছিলাম, তখন আমাদের মাথায় ছিল SEZ-এর ব্যাপারটা। এতে অনেক স্থানীয় খুঁটিনাটি আছে। এটা আন্দোলনের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করেছে।

মন্থন নাটকের নাম?

উ.ম. 'কৌন ভইনত স্বরাজম' অর্থাৎ 'কে বলে আমরা স্বাধীন?'। এতে আছে নেতারা কীভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে; কীভাবে SEZ আনা হচ্ছে; রিলায়েন্স, বহুজাতিক সংস্থা বা বিশ্বব্যাঙ্কের এতে ...

কী; এইসব। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরেই নাটক করছি। তবে এটা আমাদের তিন নম্বর নাটক।

নাটকের দলের নাম কী?

নাটকের দলের আলাদা কোন নাম নেই। এটা 'সর্বহারা জন আন্দোলন'-এর অংশ। গ্রামে গ্রামে SEZ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য এই নাটক বানানো হয়েছে। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দালালেরা আমাদের নাটক না করতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কখনও রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে। যে গ্রামে আমরা নাটক করতে যাচ্ছি, সেখানকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ওরা সমস্যা তৈরি করেছে। গ্রামের মানুষও কোন না কোন ব্যবস্থা করে দিচ্ছে নাটকটা করার জন্য। আমাদের এই নাটকের গ্রুপে যারা আছে, তারা কেউই SEZ-এর জন্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয়। এরা তো চাষীও নয়, সবাই খেতমজুর। কিন্তু আমরা আদর্শনৈতিকভাবে মানি, এই লড়াই আজ সবার লড়াই। আর রায়গড়ের ধানের যে ফলন, তাকে বাঁচালেই আমরা বাঁচব। কারণ আমাদের খেতমজুরেরা সবচেয়ে বেশি এই এলাকায় মজদুরী করতে পছন্দ করে। এখানে মজদুরী করলে মজুরি অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই একদিক থেকে মজদুরদের লড়াইয়ের সঙ্গে জুড়ে আছে চাষীদের লড়াই।

এই নাটক কোথায় কোথায় হচ্ছে?

রায়গড়ে, পুনের অনেক জায়গায়। লোকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। যে কোন জনসভার আগে হচ্ছে।

মুশকিল হল, এই নাটকের দলে সবাই রোজে কাজ করা মজদুর। তাই এত সময় দিতে পারা সমস্যা। কলকাতায় আসাও মুশকিল ছিল। কারণ লাগাতার তিনমাস ধরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন তো ধান কাটার মরসুম, এসময় বাইরে যাওয়া খুব মুশকিল।

সিঙ্গুরে কি এই নাটক আপনারা করেছেন?

না। ওখান থেকে আমাদের কিছু জানায়নি। আর আমরাও ওখানে করতে যাওয়ার কথা ভাবিনি, শুনেছি যে ওটাকে এখনও SEZ ঘোষণা করা হয়নি।

মন্থন কিন্তু কায়দাটা তো একই?

উ.ম. হ্যাঁ, তা একই।

মন্থন আচ্ছা, একটা খবর বেরিয়েছিল কাগজে, ওখানে একটা গ্রামের গ্রামসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে লোকে জমি দেবে না।

উ.ম. পঁয়তাল্লিশটা গ্রামের গ্রামসভাতেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। পেন-এর কয়েকটা গ্রামে তো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্থন সেই সিদ্ধান্ত কি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে?

উ.ম. হ্যাঁ। কিন্তু সরকার তো গ্রামসভার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মানে না। আইনে গ্রামসভার হাতে কেবল সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সরকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

মন্থন মিডিয়াও তো পাশ কাটাচ্ছে —

উ.ম. হ্যাঁ, তবে আপনাদের কলকাতার মিডিয়া একটু বেশি। এরা তো ভীষণ আক্রমণাত্মক। আর মানুষের কথা বলারই চেষ্টা করে না। মিডিয়া সিঙ্গুরে [জনশুনানির দিন] লাইভ কভারেজ করেছে। কিন্তু তাতে সেখানকার সাধারণ মানুষের কোনও কথা নেই। শুধু মহাশ্বেতা দেবী আর মেধা পাটকর। সারাদিন ধরে শুধু তাঁদের ছবি, এদিক ওদিক থেকে, তাঁদেরই ফোটো সেশন। অথচ পাশেই বাচ্চারা বসেছিল, মহিলারা বসেছিলেন। তাদের কথাবার্তা শোনার কোনও চেষ্টাই নেই।

মন্থন সারাদিন কভার করার পরেও পরের দিন এখানকার অন্যতম বড়ো কাগজ আনন্দবাজারে এক লাইনও লেখা হয়নি।

উ.ম. হ্যাঁ, এক লাইনও লেখা হয়নি। আমি যেদিন এখানে এসেছি, সেদিন থেকে দেখছি, কোনও কথা নেই আন্দোলন নিয়ে। কিন্তু গতকাল আনন্দবাজার পত্রিকা মেধা পাটকর আর এনএপিএম-এর কিছু লোকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। সিঙ্গুর নিয়েও কথা হয়েছে। আজকের খবরের কাগজে দেখতে হবে বেরিয়েছে কিনা।

মন্থন না। বেরোয়নি।

...নটিরের অভিজ্ঞতায় সিঙ্গুরের শিল্পস্থাপন ... ৫৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

...না গড়ে তুলেছে। উদ্বৃত্ত জমি বিক্রির টাকা হিন্দমোটরে বিনিয়োগ ...র সম্ভাবনাও খুবই কম। এই পুঁজিও নানান কৌশলে অন্য রাজ্যে ...র হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

...রকারি সহযোগিতা শিল্পপতিদের শিল্প গড়তে আদতে কতটা উৎসাহিত ... সেটাও প্রশ্ন। সেদিনের কংগ্রেস সরকার যেমন জমি দিয়ে বিড়লাদের ...যোগিতা করেছিল, বাম সরকার তেমনই সুকৌশলে ভারতের অন্যান্য ...ড়ি তৈরির কারখানার তুলনায় অর্ধেক মজুরিতে শ্রমিকদের এখানে কাজ ...তে বাধ্য করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিড়লাদের গাড়ির একচেটিয়া বাজার ...ছিল। ১৯৫৫ সালে তারিফ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অটোমোবাইল ...রর বিকাশের স্বার্থে ভারতের ছ'টি গাড়ি উৎপাদক কোম্পানিকে অনুমতি ...ওয়া হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্দমোটর। পাশাপাশি, গাড়ি আমদানির ...পর তখন বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছিল। ফলে প্রথম যুগের গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান মোটরস একাধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষমও হয়েছিল। এতসব সরকারি অনুগ্রহ নিয়েও তো শিল্পটিকে বাঁচানো যাচ্ছে না। আজ এই কারখানাটি টিকে আছে শ্রমিকদের মজুরি না দিয়ে।

সিঙ্গুরে টাটার প্রায় একহাজার একর জমির দাবি তাই সন্দেহজনক। স্বয়ং জ্যোতি বসুও তো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। চাষীদের সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কাও অতীতে অমূলক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণত জমির মালিকেরা অনেকে জমির ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই এত শতাংশ লোক জমি বিক্রি করছে, তাতে কিছু বোঝা যায় না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে উর্বরা জমি হিন্দমোটর মালিকেরা ফেলে রেখে দিল, খাদ্য উৎপাদনে ওই জমির কী ভূমিকা থাকত, এ প্রশ্ন কি আজ করব না? টাটারা যদি একহাজার একর জমির কিছু অংশ ফাটকাবাজীর জন্য কুড়ি বছর অযথা ফেলে রেখে দেয়, তাহলে খাদ্য উৎপাদনের কতটা ক্ষতি হবে, এটাও কি বিচার্য নয়?